১০ম সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১৯ - জানুয়ারি ২০২০

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছরপূর্তি উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন	০৪
ক্ষোভ, হতাশা ও সেনা দমন-পীড়নের মধ্যে পার্বত্য চুক্তির ২২ বছর পালিত	০৭
প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ভূমি কমিশনকে সেটেলার বাঙালিদের ঘেরাও	১২
অবৈধ গ্রেফতার, সেনা নির্যাতন ও ভূমি বেদখল	১৩
রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি ঘেরাও ও তল্লাশি	১৬
সুবলং বাজারে কথিত গ্রেনেড হামলায় পিসিপিকে জড়িত করে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ	১৬
ভূয়া ও সাজানো নির্দেশনা বা চিঠি প্রচার করে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে অপপ্রচার	১৬
লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৮ জুম্মকে নিজেদের ধান্যজমিতে চাষাবাদে বাধা প্রদান	১৭
সেনা-মদদপুষ্ঠ সশস্ত্র দলগুলোর তৎপরতা	১৭
কুহালঙে বিদেশি সন্ত্রাসী এলএলপি কর্তৃক চাকমা গ্রামে হামলা, ১টি বাড়ি অগ্নিসংযোগ	১৮
চলছে এএলপিদের চাঁদাবাজি	১৮
সংস্কারপন্থী কর্তৃক রাঙ্গীপাড়া গ্রামের কার্বারীকে অপহরণ	১৯
সাজেক-কমলাক সংযোগ সড়কে আদিবাসী জুম্মদের বাগান-বাগিচা ধ্বংস	১৯
পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত	১৯

সম্পাদকীয়

গত ২ ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ২২ বছরেও চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি, জুম্ম জনগণ ও দেশের নাগরিক সমাজ চরম হতাশা, ক্ষোভ ও উদ্বেগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পালন করেছে। অপরপক্ষে পার্বত্য মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি নানা আনুষ্ঠানিকতা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালন করলেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে কোন কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ নিতে বিন্দুমাত্র লক্ষ করা যায় না। পক্ষান্তরে সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্র পার্বত্য চুক্তি নানাভাবে পদদলিত করে পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী তথাকথিত জেএসএস (এমএন লারমা), ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) নামক তাঁবেদার সংগঠনগুলোকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে অবাধে লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার সুযোগ করে দিচ্ছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী সাজিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, একটা মামলায় জামিন পাওয়া গেলে সাথে সাথে আরেকটি সাজানো মামলায় জড়িত করে কারাগারে প্রেরণ ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্রসফায়ারের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা জোরদার হয়েছে। গত নভেম্বর ২০১৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের বিধানাবলী লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করবার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) নিয়োগ করেছে। ইহা চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের পরিপন্থী। এতে চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। এভাবে জুম্ম জনগণের মধ্যে চরম ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে জুম্ম জনগণের চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিকে দমন করা এবং আইন-শৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার অব্যাহত অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বস্তুত বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সকল বিষয় স্থানীয় সেনা ও গোয়েন্দাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

এমনিতর অবস্থায় জুম্ম জনগণ অকল্পনীয় দমন-পীড়ন, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি পরিহার করে পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে ও পূর্বের মতো ফ্যাসীবাদী দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের নামে যে কোন ধরনের অপচেষ্টা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছরপূর্তি উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছরপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ০১ ডিসেম্বর ২০১৯, রবিবার, সকাল ১১:০০টায় ঢাকার হোটেল সুন্দরবনে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক উ উইন মং জলি-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনের মূল বক্তব্য নিম্নে পত্রস্থ করা গেল–

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির সময় ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে এই অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীল-নক্সা প্রণীত হতে থাকে এবং ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের শাসনবিধি খর্ব করা শুরু হয়ে গেলো। ১৮৮১ সালে স্থাপিত ট্রাইবাল পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হলো, ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা বাতিল করা হলো, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে ভারত থেকে আশ্রিত অউপজাতীয় (মুসলমান) রিফিউজিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হলো, পাহাড়ি নেতাদের মধ্যে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করাসহ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হতে থাকে। ফলে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে এক অস্বাভাবিক ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি স্বীকৃতি লাভ করলেও এই আইন লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে জুম্ম জনগণের মতামত যাচাই না করে ১৯৫৪ সালে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা (ষড়যন্ত্র) গ্রহণ করে থাকে। জুম্ম জনগণের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালে কাপ্তাই নামক স্থানে এই বাঁধ নির্মাণ করা হলো। এই বাঁধের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের সব চেয়ে উর্বর ও বর্ধিষ্ণু ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেলো। এক লক্ষ জুম্ম উদ্বাস্তু হয়ে গেলো। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জমির বদলে জমি দেয়া হবে। সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সরকার কার্যত সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা সরকার অর্ধেকও ব্যয় করেনি বলে জানা যায়। ফলত সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে একটা অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা দেখা দেয়। উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে এ বাস্তবতার ফলশ্রুতিতে ৪০ হাজার ভারতে এবং ২০ হাজার মিয়ানমারে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য

অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভূমি, কৃষি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জুম্ম জনগণের সামগ্রিক জীবনধারা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্দশা, হাহাকার ও দুর্যোগ দেখা দেয়। কাপ্তাই বাঁধ তাই পার্বত্যবাসীদের জীবনে মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশ, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক জটিল ও অভূতপূর্ব জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানে পার্বত্যবাসীদের অস্তিত্ব সংরক্ষণার্থে একটা গণতান্ত্রিক বিশেষ শাসন ব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলের স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, জাতীয় পরিচিতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারের নিকট আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু জুম্ম জনগণের প্রবল দাবি সত্ত্বেও এ দাবি উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অপরদিকে পার্বত্যবাসীদের এই দাবি পূরণের পরিবর্তে সরকার একের পর এক দমন নীতি গ্রহণ করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে দীঘিনালা, আলিকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। জুম্ম জনগণকে সাংবিধানিকভাবে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শুরু হয় রাজাকার, মুজাহিদ দমনের নামে নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ জনগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন। ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন জারি করা হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে জুম্ম জনগণের উপর সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর অভিযান ও নির্যাতন জোরদার হয়ে উঠে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ও আত্মরক্ষার্থে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

প্রসঙ্গত ইহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে, দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান আমলে গৃহীত ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে ও পরিকল্পনাধীনে সমতল জেলাগুলো থেকে পাঁচ লক্ষাধিক বহিরাগত মুসলিম বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমির উপর সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বসতি প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে অপারেশন দাবানল নামক সামরিক শাসন জারি করা হয়। এভাবে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর সামরিক দমন পীড়ন, অবৈধভাবে বহিরাগতদের বসতি প্রদান করে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুকরণ, ভূমি বেদখল ও জুম্ম জনগণকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিতকরণ, গণহত্যা, সেনা-নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত উন্নয়ন, গ্রেপ্তার, নারী নির্যাতন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অত্যাচার উৎপীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নীতি গ্রহণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল থেকে আরও জটিলতর আকার ধারণ করেছিল। ফলশ্রুতিতে দমন পীড়ন ও অত্যাচার অবিচার থেকে রেহাই পাওয়া ও নিরাপত্তা লাভের আশায় ১৯৭৮ সাল থেকে লক্ষাধিক পাহাড়ি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের দুর্বার আন্দোলনের ফলে এবং দেশে বিদেশে প্রবল জনমতের চাপে পড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক সরকার সেই ভ্রান্ত নীতির পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মধ্যেমে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপে বসতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তৎকালীন এরশাদ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে (১৯৮৫-১৯৯০) ৬ বার, বিএনপি সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) সাথে ১৩ বার এবং শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-১৯৯৭) সাথে ৭বার অর্থাৎ মোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সমাপ্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলকে সাক্ষী রেখে সংশোধিত পাঁচদফা দাবিনামার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২২ বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকার চুক্তির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যেই সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বর্তমানে এক নাগাড়ে ১১ বৎসর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিসহ জুম্ম জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০১ সালে 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করে সেনা শাসন অব্যাহত থাকে।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে না আসার কারণে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীর মধ্যে একদিকে চরম হতাশা, অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে আর অন্যদিকে নিরাপত্তাহীন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। চুক্তি মোতাবেক বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান না করে এবং পার্বত্য চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ অবাস্তবায়িত রেখে সরকার উল্টো ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে অব্যাহতভাবে অসত্য, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন প্রচারণা দেশে বিদেশে চালিয়ে যাচ্ছে। "চুক্তি

বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক", "পার্বত্য চুক্তি শতভাগে বাস্তবায়ন করা হবে", "চুক্তির অবশিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা হবে" মর্মে বিগত এগার বছর ধরে সরকার কেবল প্রতিশ্রুতি প্রদান করে কালক্ষেপণ করে চলেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বস্তুত সরকার জুম্ম জাতিসমূহকে চিরতরে নির্মূলীকরণের হীন উদ্দেশ্যে যুগপৎ বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে একই সাথে শাসকদল এবং সরকার ও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ এর একটা বিশেষ মহল চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা ও চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি ক্ষমতাসীন দল ও সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব সশস্ত্র তাঁবেদার ও দালাল বাহিনীসহ সাম্প্রদয়িক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ যোগসাজশে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে অবৈধ গ্রেপ্তার ও জেলে প্রেরণ, গুম ও প্রাণহানি, ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ খোঁজার নামে তিন পার্বত্য জেলায় জলপথে ও স্থল পথে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্ট বসিয়ে জনগণকে নানাভাবে হয়রানিকরণ, অশালীন আচরণ, গ্রামাঞ্চলে তল্লাসী অভিযান, ধরপাকড় ইত্যাদি জোরদার করা হয়েছে।

স্থানীয় সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর তাঁবেদার সংগঠন জেএসএস (এমএন লারমা) ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক)-এর সদস্যদের রাঙ্গামাটি জেলার সুবলং বাজার, লংগদু উপজেলার তিনটিলাসহ খাগড়াছড়ি সদর জেলার বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্রভাবে মোতায়েন রেখে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থকদের উপর সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নাকের ডগায় লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদাবাজি করে চলেছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী সাজিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, একটা মামলায় জামিন পাওয়া গেলে সাথে সাথে আরেকটি সাজানো মামলায় জড়িত করে কারাগারে প্রেরণ ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এযাবৎ তিন পার্বত্য জেলায় শতাধিক মামলায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মিথ্যাভাবে আসামী করা হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতিকে একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর বলে বিবেচনা করা যায়। এ উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব (বিশেষত রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও যোগসাজশে সংস্কারপন্থী খ্যাত সেনা-সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন [যারা জেএসএস (এমএন লারমা) নামে পরিচয় দিতে আগ্রহী] এবং দলচ্যুত আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) (যারা মাঝে মাঝে মগ লিবারেশন পার্টি নামেও পরিচয় দিয়ে থাকে) নামক বিদেশী সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয় ও মদদ দিয়ে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এদের দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অপহরণের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে আর এসব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাবলীকে দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের উপর নির্বিচারে সেনা অভিযান, তল্লাসী ও দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করেই পার্বত্য মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৬-১৭ অক্টোবর তারিখে রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, হানাহানি, চাঁদাবাজি ও অস্ত্রবাজির একতরফা অভিযোগ এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে "সামনে ভয়ঙ্কর দিন" আসার হুমকি ও উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এভাবে জুম্ম জনগণের মধ্যে চরম ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে জুম্ম জনগণের চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিকে দমন করা এবং আইন-শৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার অব্যাহত অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজ পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। জুম্ম জনগণ অকল্পনীয় দমন-পীড়ন, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। যেই রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল সেই রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে সরকার একটা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজি দল হিসেবে চিহ্নিত করে পার্বত্য চুক্তিকে নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে কোন ঘটনা সংঘটিত হলেই সেই ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মিথ্যেভাবে অভিযুক্ত করে এযাবৎ শত শত সদস্যকে ফেরারী করা হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতির কাঠামো তছনছ করে দেয়া হয়েছে ও বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করে জেলে অন্তরীণ করা হয়েছে।

সত্তর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী, অগণতান্ত্রিক, উপনিবেশবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে মূল্যায়ন করে জুম্ম জনগণের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত চার দফা দাবিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং জুম্ম জনগণের যে কোন দাবি-দাওয়া পূরণে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করা হয়েছিল। সর্বোপরি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানেও ঠিক সেভাবে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সকল বিষয় স্থানীয় সেনা ও গোয়েন্দাবাহিনীর হাতে তুলে

দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য ঔপনিবেশিক কায়দায় আজ জুম্ম জনগণ শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত জুম্ম জনগণের পরিচয় ও জীবনধারা সম্পর্কে জানে না। বস্তুত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে এদেশের শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সচেতনতা ও সুচতুরতার সঙ্গে আড়াল করে রেখে চলেছে। তাই পার্বত্য অঞ্চলে ঔপনিবেশিক কায়দায় যে সেনা শাসন চলছে, যে জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছে; জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্তির যে ষড়যন্ত্র চলছে; সারাদেশে উগ্র জাত্যাভিমান ও ইসলামীকরণের যে অভিযান চলছে সে সম্পর্কে এদেশের অসম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজকে সঠিক তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না। এমনকি এদেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও বামপন্থী ব্যক্তি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জাতিসমূহের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন কর্মসূচি গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করতে এযাবৎ কোন সরকার উৎসাহিত করেনি, বরঞ্চ প্রতি পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পরিশেষে পার্বত্যবাসীর পক্ষে সবিনয়ে একথা ব্যক্ত করতে চাই- আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের প্রধান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলাম। শান্তিপূর্ণ ও শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত একটা নিরাপদ জীবন পাওয়ার আশায় পার্বত্যবাসীরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আমায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২২ বছর অপেক্ষা করেও পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেওয়া হলো না। সেটি আজ সুদূরপরাহত। এটি পার্বত্যবাসীরা কখনও ভুলতে পারে না। অগণিত মানুষের তাজা রক্ত আর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, অকল্পনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন-পীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্ম জনগণ বৃথা যেতে দিতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি পরিহার করে পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, পার্বত্যবাসীর জমি বেদখল করে, জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে, সামরিক উপায়ে দমন পীড়নের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ করে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত ও ফেরারী করে এবং নেতৃস্থানীয় সদস্যদের বন্দী ও জীবনহানি করে, জুম্ম জনগণকে নানা মিথ্যা অভিযোগে জিম্মি করে আর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ আখ্যা দিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের নামে যে কোন ধরনের চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না।

বলাবাহুল্য জনসংহতি সমিতির তথা জুম্ম জনগণের পিঠ আজ আগের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন পথ নেই। জুম্ম জনগণ ২২ বছর ধরে চুক্তি বাস্তবায়ন অপেক্ষা করেছে। জুম্ম জনগণ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীকে অনেক সময় দিয়েছে। জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে দুর্বলতর ও পশ্চাৎপদ। তাই বলে তারা অবহেলা ও উপেক্ষার পাত্র হতে পারে না। জুম্ম জনগণ অধিকারকামী ও মুক্তিকামী। আর এটাই তাদের একমাত্র সম্বল। এমনিতর ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। জুম্ম জনগণ সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চায়। তাই পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তারা আজ গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে তাদের করণীয় কী হতে পারে। বলাবাহুল্য পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আজ দুটি পক্ষ পরস্পরে মুখোমুখী অবস্থানে দণ্ডায়মান। একপক্ষ চুক্তি বাস্তবায়ন চায় আর অন্যপক্ষ চুক্তি পদদলিত করতে উদ্যত।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া পার্বত্য সমস্যার সমাধানের আর কোন বিকল্প নেই।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

ক্ষোভ, হতাশা ও সেনা দমন-পীড়নের মধ্যে পার্বত্য চুক্তির ২২ বছর পালিত

২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২২ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ বছর চরম হতাশা, ক্ষোভ ও উদ্বেগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পালিত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেছেন, চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার একনাগাড়ে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে না আসার কারণে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীর মধ্যে একদিকে চরম হতাশা, অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে আর অন্যদিকে নিরাপত্তাহীন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় নাগরিক সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, পার্বত্য চুক্তির ২২ বছর পরও পাহাড়ে শান্তি ফেরেনি। সবাই আশা করেছিল, বহু কাঙ্ক্ষিত এই রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু ২২

বছরেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত করা হয়নি। বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মদের ওপর দমন-পীড়ন, জুলুম, নির্যাতন, ধরপাকড়, অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এ পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজও হতবাক এবং উদ্বিগ্ন। চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনও বাস্তবায়ন হয়নি জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে দ্রুত কার্যকর ও চুক্তির সব ধারা অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি করেন তারা।

গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ রবিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছরপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ঢাকার হোটেল সুন্দরবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে জনসংহতি সমিতির সভাপতি এমন বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক উ উইন মং জলি-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে শ্রী লারমা বলেন, আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের প্রধান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলাম। শান্তিপূর্ণ ও শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত একটা নিরাপদ জীবন পাওয়ার আশায় পার্বত্যবাসীরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আমায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২২ বছর অপেক্ষা করেও পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেওয়া হলো না। সেটি আজ সুদূরপরাহত। এটি পার্বত্যবাসীরা কখনও ভুলতে পারে না। অগণিত মানুষের তাজা রক্ত আর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, অকল্পনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন-পীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্ম জনগণ বৃথা যেতে দিতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি পরিহার করে পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, পার্বত্যবাসীর জমি বেদখল করে, জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে, সামরিক উপায়ে দমন পীড়নের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ করে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত ও ফেরারী করে এবং নেতৃস্থানীয় সদস্যদের বন্দী ও জীবনহানি করে, জুম্ম জনগণকে নানা মিথ্যা অভিযোগে জিম্মি করে আর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ আখ্যা দিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের নামে যে কোন ধরনের চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আরো ৭৮টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আছে। তারা চায় তাদের মৌলিক অধিকার, সমঅধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। সুতরাং রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছিল। তিনি সরকারের কাছে প্রশ্ন তুলে বলেন, দীর্ঘ ২২ বছর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে ঠিক কত বছর পর বাস্তবায়ন হবে?

ঐক্যন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে এই রাষ্ট্র উদার রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না। যে চুক্তি ২২ বছর আগে করা হয়েছিলো সে চুক্তি এত

বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়। তিনি অতি দ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অপরদিকে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তির ২২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চুক্তির বর্ষপূর্তি পালনের অনুষ্ঠান করেছে। জনসংহতি সমিতি এই উপলক্ষে রাঙ্গামাটি জিমনেসিয়াম মাঠে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সদস্য শ্যাম রতন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আশোক সাহা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ মাইদুল, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির অরুন ত্রিপুরা, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি জুয়েল চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার প্রধান অতিথির ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমরা দেশদ্রোহী, নই আমরা সরকার ও সেনাবাহিনী বিরোধী নই। আমরা আমাদের অধিকার আমাদের অধিকারের কথা বলছি। আমরা পার্বত্য চুক্তির যাথাযথ বাস্তবায়ন চাই। আমরা এই মাসের মধ্যে ভূমি, পর্যটন ও বন বিভাগ জেলা পরিষদের নিকট যথাযথ হস্তান্তর চাই। চুক্তি বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ায় মানুষের মনে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। একটি মহল জনসংহতি সমিতিকে সন্ত্রাসী হিসেবে রং দিতে চাচ্ছে। আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা চাই। উদার মানসিকতা নিয়ে এখানের সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

২ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডির উইমেন্স ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউভিএ) মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হোক জাতীয় অঙ্গীকার' শীর্ষক এ আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য। আলোচনায় অংশ নেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক কবি সোহরাব হাসান, অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন কণা, এএলআরডির শামসুল হুদা, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, পার্বত্য চুক্তির ২২ বছর পরও পাহাড়ে শান্তি ফেরেনি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সবাই আশা করেছিল, বহু কাঙ্ক্ষিত এই

রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু ২২ বছরেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি। বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মদের ওপর দমন-পীড়ন, জুলুম, নির্যাতন, ধরপাকড়, অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এ পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজও হতবাক এবং উদ্বিগ্ন। চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনও বাস্তবায়ন হয়নি জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে দ্রুত কার্যকর ও চুক্তির সব ধারা অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি করেন তারা।

আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, গত ২২ বছরে আদিবাসী ও পাহাড়িদের পুনর্বাসনের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সন্তু লারমা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক নয়। দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার জনসংহতি সমিতিকে 'সন্ত্রাসী' ও 'চাঁদাবাজ' সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করছে। এর পরিণতি শুভ হবে না।

ড. মিজানুর রহমান বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে চুক্তি করা বা না করার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পাহাড়িদের ভূমির ওপর অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। তাদের ভূমির অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা থাকবে না– এমন ধারণা সঠিক নয়। চুক্তির ধারাগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকারের ঘাটতি রয়েছে। তাই চুক্তির পর ২২ বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকারের ভাষায় চুক্তির ৭২টির মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে। একাধিক জাতীয় দৈনিকের ক্রোড়পত্রে গতকাল সন্তু লারমার কোনো বক্তব্য প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থমকে গেছে। চুক্তি যেহেতু হয়েছে, এটা বাস্তবায়ন করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। চুক্তি বাস্তবায়ন হলে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও বাড়বে।

সাংবাদিক সোহরাব হাসান বলেন, চুক্তিতে ছিল অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে নেওয়া হবে; কিন্তু তা তুলে হয়নি। এটা সরকারের চরম ব্যর্থতা বলা যায়।

৪ ডিসেম্বর ২০১৯ বুধবার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর উপলক্ষে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে 'পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন বনাম পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি' শীর্ষক এক জাতীয় সংলাপের

আয়োজন করে বেসরকারি সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল।

উক্ত সংলাপে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের চিত্র হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের পরিস্থিতি এখন যেন জিয়া ও এরশাদের আমলে ফিরে গেছে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয় পাহাড়ে। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন মেনন। তিনি ১৯৭৯ সালে সাংসদ হন, যখন তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকারের উদ্যোগে পাহাড়ে বাঙালি অভিবাসন শুরু হয়। মেনন জানান, তাঁর সংসদীয় আসনের নদীভাঙা মানুষের তালিকা তৈরি করে তাদের পাহাড়ে পাঠানোর জন্য সরকারি নির্দেশ পেয়েছিলেন। তবে তিনিসহ কিছু সাংসদ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ওই অভিবাসন প্রক্রিয়া পরে আরেক সামরিক শাসক এইচ এম এরশাদের সময় পর্যন্ত চলে। মেনন বলেন, 'জিয়া ও এরশাদ কেউই পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজেননি।'

১৯৯১ সালে তৎকালীন মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পাহাড়ে সশস্ত্র লড়াইরত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ শুরু হয়। এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে করা কমিটির সদস্য ছিলেন সাংসদ রাশেদ খান মেনন। তবে তৎকালীন সরকারের সময় সমঝোতা শেষতক হয়নি। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় চুক্তি হয়। শেষ হয় দুই দশকের লড়াই। ওই চুক্তিতে ৭২টি ধারা ছিল। কিন্তু ২২ বছরেও এসব ধারার বেশির ভাগ বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ করে আসছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। রাশেদ খান মেনন বলেন, 'এত দিনেও চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাস্তবায়ন না হওয়া সত্যি হতাশাজনক। চুক্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসম্ভব সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনার ঐকান্তিকতা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মেনে নিতে পারেনি।' তিনি বলেন, 'এখন পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। এখন যেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে সবকিছু।'

উক্ত সংলাপে চাকমা সার্কেলের প্রধান রাজা দেবাশীষ রায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশবাসী জানে না পার্বত্য চট্টগ্রামে কেমন পরিস্থিতি চলছে। এতে রাজা দেবাশীষ রায় পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ভূমি সমস্যা, চুক্তি বাস্তবায়নে নানা পক্ষের অবস্থান, সরকার গঠিত পার্বত্য ভূমি কমিশনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলেন। তিনি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ তুলে বলেন, 'এখন পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসা হচ্ছে। চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই।'

রাজা দেবাশীষ অভিযোগ করেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এলাকা, আজ সেই পরিচিতিটাই মুছে ফেলা চেষ্টা চলছে। এর স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার উদ্যোগ আছে অনেক ক্ষেত্রে। অথচ সরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তাতে এই অঞ্চলকে 'অনগ্রসর, উপজাতি অধ্যুষিত' এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে থেকে পাঠানো সুপারিশমালার সমালোচনা করেন দেবাশীষ রায়। চার দফা সুপারিশমালার প্রথমটিতে বলা হয়, 'নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন কর্তৃক বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ এবং হেয়প্রতিপন্ন না করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।' এ প্রসঙ্গে দেবাশীষ রায় প্রশ্ন রাখেন, এই সুপারিশমালায় স্থানীয় পাহাড়িদের প্রতি মানবিক আচরণ করার কথা কি একটু বলা যেত না?

সংলাপে সভাপতির বক্তব্যে মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে অদৃশ্য বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এর বাস্তবায়নে অকারণ কালক্ষেপণ দেখে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তিনি বলেন, আজ যারা ক্ষমতায়, তারাই এই চুক্তি করেছিল। তাই এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাদের নিতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, এই চুক্তির একটি পক্ষ রাষ্ট্র। তাই তাদের দায়িত্ব বেশি। চুক্তি বাস্তবায়ন করতে আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে।

অনুষ্ঠানের প্যানেল আলোচক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক বলেন, '১৯৯৭ সালে চুক্তি সম্পাদনের সময় ভাবিনি ২২ বছর পরও এর বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলতে হবে। ভেবেছিলাম, পাহাড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি কমবে। কিন্তু আজও তা কমেনি।'

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, পার্বত্য সমস্যা কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা না। এটি রাজনৈতিক সমস্যা। এর বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ নেই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান বলেন, চুক্তির পর পাহাড়ি মানুষের মধ্যে আশার আলো জ্বলেছিল। সেই আলো নিভে আসছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন এএলআরডির চেয়ারপারসন খুশী কবির, পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার আন্দোলনের নেতা জুয়াম লিয়ান আমলাই প্রমুখ।

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ অফিসে সম্প্রতি স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের রাঙ্গামাটি শাখা অফিসে ভূমি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বোমাং সার্কেল চীফ উ চ প্রু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা প্রমুখ কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের অপর সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে মং সার্কেল চীফ সাচিং প্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় অতিরিক্ত কমিশনার সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সভায় বান্দরবান জেলায় লাদেন বাহিনী কর্তৃক শত শত একর ভূমি বেদখল, বাঘাইছড়ি উপজেলায় শিজকমুখ বৌদ্ধ বিহারের জায়গার উপর জোরপূর্বক সেনা ক্যাম্প স্থাপন, দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় কথিত সোনামিয়া টিলায় সেটেলারদের ভূমি দখলের পাঁয়তারা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের গোয়েন্দা পরিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত সার্কুলেশনের বরাত দিয়ে ১লা নভেম্বর ২০১৮ "সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং বাঙালি আঞ্চলিক দলসমূহের প্রতি নিরাপত্তা বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের বর্তমান মনোভাব এবং সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব প্রসঙ্গে" শীর্ষক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বান্দরবানে কমিশনের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ভূমি কমিশনকে সেটেলার বাঙালিদের ঘেরাও

ভূমি কমিশনের সভায় যোগদান করতে যাওয়ার পথে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ সকাল ৯:৩০ ঘটিকার দিকে রাঙ্গামাটি প্রধান সড়কের পাবলিক হেল্‌থ এলাকায় ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল হকসহ কমিশনের অন্যতম সদস্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়কে সদ্য গঠিত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ'-এর ব্যানারে সেটেলার বাঙালিরা অবরোধ করে। এ সময় সেটেলার বাঙালিরা ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান-সদস্যদেরকে প্রায় পৌনে একঘন্টা আটকে রাখে। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান-সদস্য, ভূমি কমিশনের আইন ও বিধিমালার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে এবং উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান-সদস্যদের ঘেরাও করার জন্য সেটেলার বাঙালিরা আগে থেকে ঘোষণা দিলেও এবং সকাল থেকে মাইক টাঙিয়ে ভূমি কমিশনের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক, হুমকিমূলক ও

সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিতে থাকলেও প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তরফ থেকে নিরাপত্তামূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি সকাল থেকে চলমান সেটেলার বাঙালিদের ব্যারিকেডের আশেপাশেও কোন পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি। অথচ সেসময় গোয়েন্দা বাহিনীর অনেক সদস্য সেটেলার বাঙালিদের ব্যারিকেড প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, সেটেলার বাঙালিদের এই বিক্ষোভের পেছনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। তাদের ইন্ধন ও সহায়তা ব্যতীত প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাগের ডগায় নির্বিঘ্নে ও অবাধে এভাবে সেটেলার বাঙালিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো না।

ভূমি কমিশনের সভা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সেটেলার বাঙালিদের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তারা ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবি-দাওয়ার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– বর্তমান ভূমি কমিশন বাতিল করা, ভূমি কমিশনের আইন সংশোধন করা, ভূমি কমিশনে সমসংখ্যক বাঙালি সদস্য নিয়োগ করা, ভূমি কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ রাখা ইত্যাদি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভূমি কমিশনে বাঙালিদের কোন প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। ভূমি কমিশন আইন বৈষম্যমূলক। প্রচলিত আইন, আদালত ও ভূমি সংক্রান্ত দলিলাদিকে পাশ কাটিয়ে রীতি-নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অসমতা সেটেলার বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য হিসেবে দেখছে। যার ফলে ভূমি কমিশনের কার্যক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে বলে সেটেলার প্রতিনিধিরা যুক্তি তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য যে, আশি দশকে সরকারি উদ্যোগে বসতিকারী সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা আদিবাসী জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, সেটেলার বাঙালিদের নামে অবৈধ বন্দোবস্ত প্রদান, সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের উচ্ছেদ ইত্যাদির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা জটিল হয়ে উঠে। জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠনের বিধান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে রাখা হয়েছিল।

অবৈধ গ্রেফতার, সেনা নির্যাতন ও ভূমি বেদখল

জুম্ম অধিকার কর্মীদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিতকরণের সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসেম্বর মাসে সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে চারজন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গ্রেফতার এবং কয়েকটি ঘরবাড়ি তল্লাসী করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে দুইজনকে তাদের লাইসেন্সকৃত বন্দুক থানা থেকে নবায়নের পর ফেরার পথে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে অস্ত্র ও চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করে আদালতে হাজির করা হয়। অপর আটককৃতদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন নিরীহ শিক্ষকও রয়েছেন। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী সেবে চিহ্নিত করে অপপ্রচারের হীনলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদা আদায়ের জন্য জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পক্ষে সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার নামে ও ভূয়া স্বাক্ষর সম্বলিত

হিএকটি ভূয়া, সাজানো ও ভিত্তিহীন নির্দেশনা/চিঠি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাড়া হয় এবং সেই ভূয়া দলিলের উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কতিপয় নিউজপোর্টালে কল্পিত সংবাদ প্রচার করা হয়। ডিসেম্বর মাসে সেনা-সমর্থিত সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক দুইজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

গত ২ নভেম্বর ২০১৯ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় লংগদু জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন বামে লংগদু সাব-জোন কম্যান্যার সুবেদার মো: সোলায়মানের নেতৃত্বে ১২/১৩ জনের একদল সেনা লংগদু উপজেলাধীন কাউলী গ্রামে তল্লাসী অভিযান চালায়। এ সময় প্রতিটি বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, পরিবার প্রধানের নাম ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করে। এলাকায় কোন সন্ত্রাসী আছে কিনা, থাকলে কোথায় থাকে, গ্রামে সন্ত্রাসী আসলে সেনাবাহিনীকে খবর দেয়া ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্দেশ দিয়ে আসে।

অপরদিকে গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ সকাল ৮:০০ ঘটিকার দিকে রাঙ্গামাটি শহরের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে সেনা গোয়েন্দারা বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পরায়ন চাকমাকে গ্রেফতার করে। তাঁকে দুইদিন ধরে রাঙ্গামাটি সেনা জোনে আটকে রাখার পর কোতোয়ালী থানায় সোপর্দ করে। সুবলঙে স্মৃতিময় চাকমা কোকোকে হত্যার মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করে জেলে প্রেরণ করা হয় বলে জানা যায়।

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি জানিয়েছে যে, বস্তুত জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এধরনের কোন নির্দেশনা জারি করা হয়নি কিংবা জারি করার প্রশ্নই উঠে না। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও ভূয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির বিরোধী কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও রাজনৈতিক হীনউদ্দেশ্যে এ ধরনের ভূয়া ও সাজানো নির্দেশনা বা চিঠি প্রচার করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও ভূয়া নির্দেশনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা এবং কোনরূপ সত্যাসত্য যাচাই না করে সেই ভূয়া চিঠির উপর ভিত্তি করে সংবাদ প্রকাশ করায় জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ সোমবার ভোররাতে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের পানছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তরুণ কান্তি চাকমা (৫২), পিতা- মৃত নাগর চান চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য গ্রেফতার করে।

জানা যায়, সেনা সদস্যরা ভোর রাত ৩টার সময় তার বাড়িটি ঘেরাও করে দরজা খুলতে আদেশ দেয়। তার স্ত্রী দরজা খুলে দেয়ার সাথে সাথে সেনা সদস্যরা রুমের ভিতর প্রবেশ করে তরুণ কান্তি চাকমাকে বেধে আটক করে। তারপর তার কাছে অস্ত্র ও গুলির খোঁজ করতে থাকে। তার কাছে কোন গোলা বারুদ নেই বলার সাথে সাথে শুরু হয় মারধর এবং অমানুষিক নির্যাতন। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে তল্লাশী করা হয়। ওয়াড্রব ও শো কেসের কিয়দংশ ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু তারা কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। এসময় তারা তরুণের পুত্রবধু ও নাতির জমানো ৯,৪০০ টাকা নিয়ে যায়। তার ও তার সহধর্মিনীর ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনও নিয়ে যায়।

তরুণের সহধর্মিনী দিনমুখী চাকমা জানান, 'সেনাদের বেদম প্রহারে আমার স্বামী অজ্ঞান হয়ে পড়লে তারা নিজেরাই মাথায় পানি ঢেলে দেয়। আঘাত করে ৪টি লাঠি তার শরীরে ভাঙা হয়। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র বা গুলি নেই বলায় আমাকেও দুই চড় দেওয়া হয়'। ৮/১০ জনের সেনাদলটি উল্টা রাঙি পাড়া থেকে ৩টি সিএনজি যোগে কাউখালী সদরের কাশখালীতে অপেক্ষমান সেনা পিকআপে তরুণ কান্তি চাকমাকে তুলে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বলে জানা গেছে।

আটকের এক সপ্তাহ পরে সেনাবাহিনী উক্ত স্কুল শিক্ষককে অস্ত্র গুজে দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়। টানা এক সপ্তাহ ধরে শারীরিক নির্যাতনের পর অস্ত্রমার্কা ছবি দিয়ে নাটকীয়ভাবে বানানো হলো সশস্ত্র সন্ত্রাসী। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই নাটক কিংবা নাটকীয় চিত্র নতুন কিছু নয়। এভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জুম্মদের প্রতিনিয়ত হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়। পরিকল্পিতভাবে নিরীহ জুম্মদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তারপর অস্ত্রমার্কা ছবি দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ করা আর ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে ক্রসফায়ার বলে গণমাধ্যমে প্রচার করা এগুলি সেনাবাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের জারুলগ্রাম থেকে বন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও মন কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। জানা যায় যে, সেদিন তারা দু'জনে তাদের লাইসেন্সকৃত বন্দুক নবায়নের জন্য রাজস্থলী থানায় নিয়ে আসেন। উক্ত বন্দুকসহ তারা তাদের গ্রামে ফেরার পথে রাস্তা নির্মাণকারী বাঙালি শ্রমিকরা দেখলে এই মর্মে তারা সেনা ক্যাম্পে খবর দেয় যে, এলাকায় বন্দুকধারী সন্ত্রাসী এসেছে এবং তাদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করছে। বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকদের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে রাজস্থলী সাব-জোন থেকে একদল সেনা গিয়ে বন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও মন কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের অমানুষিক মারধরের পর সেনা সদস্যরা রাজস্থলী থানায় সোপর্দ করে। লাইসেন্সকৃত বন্দুক বিধায় রাজস্থলী থানার ওসি মামলা নিতে না চাইলেও সেনা সদস্যরা থানার ওসিকে বাধ্য করে অস্ত্রবাজি ও চাঁদাবাজির মামলা দিয়ে তাদেরকে জেলে প্রেরণ করতে।

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ দুপুর পৌনে ১টার দিকে খাগড়াছড়ি উপজেলা সদরের পেরাছড়া ইউনিয়নের ইটভাটা এলাকা থেকে সেনাবাহিনী দুই জনকে আটক করে। জানা যায়, আটককৃতরা হলেন মাইসছড়ির বাসিন্দা অজিত কুমার চাকমার ছেলে নিতু চাকমা

ও পেরাছড়ার বাসিন্দা সোনালী বিকাশ ত্রিপুরার ছেলে প্ললিময় ত্রিপুরা। তাদের কাছ থেকে ২টি আমেরিকার তৈরি পিস্তল ও ম্যাগজিন ভর্তি ৩ রাউন্ড গুলিসহ আটক করে বলে সেনাবাহিনী দাবি করে। আটককৃতদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ দিবাগত রাত ৩.০০ ঘটিকার সময় শুভলং আর্মি ক্যাম্প থেকে ২০/২২ জনের সেনাবাহিনীর একটি দল লংগদু উপজেলাধীন ভাসন্যাদাম ইউপি'র খাগড়াছড়ি গ্রামের নিবাসী সুবল চাকমা'র বসতঘর ঘেরাও করে এবং সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে সম্পূর্ণ ঘর তল্লাশী চালায়। ঘরে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে ঘরের মালিকের নাম-ঠিকানা নিয়ে প্রায় একঘন্টা অবস্থান করার পর সেখান থেকে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীদের সাথে মুখোশ পরা অবস্থায় তিনজন ভাড়াটে দালাল ছিল, তবে তাদেরকে কেউ চিনতে পারেনি বলে জানিয়েছে।

আদালতে জামিনে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৮ জন সদস্য গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বান্দরবান চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিতে গেলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণ করেছে। ২০১৬ সাল থেকে জামিনে থাকা দু'টি মামলায় হঠাৎ করে জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের পেছনে স্থানীয় শাসকদল ও বিশেষ বাহিনীর গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে জানা গেছে। এতে এলাকার মানুষ হতবাক হয়েছে, অনেকে জানিয়েছে চরম ক্ষোভ।

কারাগারে পাঠানো জনসংহতি সমিতির সদস্যরা হলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক জলি মং, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কে এস মং মারমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক সাধুরাম ত্রিপুরা, বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যাবা মং মারমা, জেলার সহ সভাপতি অংথোয়াইচিং মারমা, জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সদর উপজেলা কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক হেডম্যান মংপু মারমা, সদস্য চাইহ্লা মারমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার হীনউদ্দেশ্যে শাসকদল ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্রে ২০১৬ সালে বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির শত শত সদস্যদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হলো চাঁদাবাজির ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে বান্দরবান সদর থানায় আবদুল করিম কর্তৃক ১ আগস্ট ২০১৬ সালে জনসংহতি সমিতির ১১ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মিথ্যা মামলা (মামলা নং জিআর ১৯৯/১৬) এবং মংসানু মারমা কর্তৃক ১৮ আগষ্ট ২০১৬ সালে জনসংহতি সমিতির ১৮ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আরেকটি সাজানো মামলা (মামলা নং- জিআর ২২৪/১৬)। এই দু'টি মামলার অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক।

উক্ত দু'টি মামলাসহ বিভিন্ন সময়ে দায়েরকৃত মামলায় উচ্চ আদালতের জামিন নিয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ নিয়মিত নিম্ন আদালতে হাজিরা দিয়ে আসছেন। যেহেতু উক্ত দু'টি কথিত মামলা সাজানো ও ষড়যন্ত্রমলক, তাই ইতোমধ্যে ১লা আগস্ট দায়েরকৃত মামলার বাদী আবদুল করিম তার মামলা তুলে নেয়ার জন্য আদালতে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন। অপরদিকে ১৮ আগস্ট দায়েরকৃত মামলার বাদী মংসানু মারমাও অভিযুক্ত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সাথে সমঝোতা করেছেন। বান্দরবান শহরে যে জায়গাটি কেন্দ্র করে মংসানু মামলাটি দায়ের করেন, সমঝোতার পর সেই জায়গাটি স্থানীয় আওয়ামীলীগের পক্ষে ক্যশৈহ্লা ইতোমধ্যে কিনে নিয়েছেন। কিন্তু আবদুল করিম কর্তৃক মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন সত্ত্বেও ও মংসানু মারমা কর্তৃক সমঝোতার পরও পার্বত্য চুক্তি বিরোধী একটি প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্রে জনসংহতি সমিতির উক্ত সদস্যদের নাম উল্লেখ করে পুলিশ উক্ত দু'টি মামলার চার্জশীট আদালতে জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। উক্ত ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে গত ১২ জানুয়ারি স্থায়ী জামিনের জন্য বান্দরবান চীফ জুডিসিয়াল আদালতে হাজির হলে জনসংহতি সমিতির উল্লেখিত ৮ জন সদস্যকে আদালতের বিচারক কামরুন্নাহার তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে ১৯ জানুয়ারি এক শুনানীতে দায়রা জজ

আদালত তাদেরকে স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করলে জেল থেকে ছাড়া পান জনসংহতি সমিতির ৮ নেতা।

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ সকাল আনুমানিক ১১:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পৌরসভার টিটিসি সড়ক থেকে সুশীল চাকমাকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁকে ১৫ জানুয়ারি কোতোয়ালী থানায় সোপর্দ করা হয়।

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২০ বাঘাইছড়ি উপজেলায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের রেস্ট হাউজে সংস্কারপন্থী, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর মধ্যে একটি গোপন মিটিং অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। সংস্কারপন্থীদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানজীব চাকমা ও সদস্য রুবেল চাকমা, আওয়ামী লীগ থেকে সাধারণ সম্পাদক গিয়াজ উদ্দিন আল-মামুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলি হোসেন, আমতলী ইউপি চেয়ারম্যান রাসেল চৌধুরী, ডিজিএফআই ও এনএসআই থেকে ৪ চারজন উপস্থিত ছিলেন। তবে সভায় কী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানা যায়নি।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি ঘেরাও ও তল্লাশি

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ ভোর সকালে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলং সেনাক্যাম্প এর ২০-২৫ জনের একদল সেনাসদস্য স্পীডবোট যোগে এসে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার রাজদ্বীপ এলাকায় পিসিজেএসএস এর সদস্য ফরেন চাকমার (৩৩) বাড়ি ঘেরাও ও তল্লাশি করে এবং পার্শ্ববর্তী নিরুময় চাকমা (৪১) ও কৌশল্যে মা (৪৯) নামের আরও দুইটি বাড়ি তল্লাশি করে। এসময় ফরেন চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। সেনাসদস্যরা ফরেন চাকমার ভাই নিপুন চাকমাকে আটক করে তাদের সাথে এলাকায় তল্লাশী চালানোর সময় সাথে নিয়ে যায় এবং পরে বাড়ির পার্শ্ববর্তী লিচুবাগান এলাকা থেকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়। জানা গেছে, এসময় সেনাবাহিনীর সাথে সংস্কারপন্থী গ্রুপের সদস্য রূপায়ন চাকমা, যিনি একসময় রাজদ্বীপে অবস্থান করতেন এবং মুখে কালো কাপড় বাঁধা অবস্থায় সংস্কারপন্থী আরও একজন এই তল্লাশি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

সুবলং বাজারে কথিত গ্রেনেড হামলায় পিসিপিকে জড়িত করে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১লা নভেম্বর ২০১৯ রোজ শুক্রবার আনুমানিক রাত ৮:০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলায় সুবলং বাজারে কথিত গ্রেনেড হামলার ঘটনায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে জড়িত করে বাংলাদেশ প্রতিদিন নামক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

গত ২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দপ্তর সম্পাদক মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়– "পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সক্রিয় সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একটি সশস্ত্র গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিদ্রোহী গ্রুপ এম এন লারমা অর্থাৎ সংস্কারপন্থী সুবলং কার্যালয়ে হঠাৎ গ্রেনেড হামলা করে"। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে জড়িত করে প্রকাশিত সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এধরনের কোন সশস্ত্র গ্রুপও নেই এবং এধরনের সশস্ত্র তৎপরতার সাথেও জড়িত নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মনে করে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে চালিয়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করার জন্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীনউদ্দেশ্যে এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের বিরুদ্ধে কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পরিচালিত হলুদ সংবাদপত্র মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সামগ্রিক স্বার্থে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানায়।

ভূয়া ও সাজানো নির্দেশনা বা চিঠি প্রচার করে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে অপপ্রচার

গত ২২ নভেম্বর ২০১৯ জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় যে, অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদা আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পক্ষে সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার নামে ও ভূয়া স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ভূয়া, সাজানো ও ভিত্তিহীন নির্দেশনা/চিঠি কে বা কারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়েছে এবং সেই ভূয়া দলিলের উপর ভিত্তি করে কতিপয় অনলাইন পত্রিকা যেমন– পার্বত্যনিউজ.কম, আলোকিত রাঙ্গামাটি, বাংলা টিবিউন ইত্যাদি নিউজপোর্টালে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

বস্তুত জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এধরনের কোন নির্দেশনা জারি করা হয়নি কিংবা জারি করার প্রশ্নই উঠে না। এটি সম্পূর্ণভিত্তিহীন, বানোয়াট ও ভূয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও

জনসংহতি সমিতির বিরোধী কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও রাজনৈতিক হীনউদ্দেশ্যে এ ধরনের ভূয়া ও সাজানো নির্দেশনা বা চিঠি প্রচার করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও ভূয়া নির্দেশনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা এবং কোনরূপ সত্যাসত্য যাচাই না করে সেই ভূয়া চিঠির উপর ভিত্তি করে সংবাদ প্রকাশ করায় জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৮ জুম্মকে নিজেদের ধান্যজমিতে চাষাবাদে বাধা প্রদান

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ২৫নং সোনাই মৌজার অন্তর্গত বড়পেরা এলাকায় স্থানীয় অধিবাসী ১) দেব কুমার চাকমা, ২) মিয়াধন চাকমা, ৩) যুবেশ কান্তি চাকমা, ৪) লক্ষী কুমার চাকমা ৫) কৃষ্ণ মোহন চাকমা, ৬) জ্ঞানময় চাকমা, ৭) মঙ্গল চন্দ্র চাকমা ও ৮) ফুল মোহন চাকমা প্রমুখ পাহাড়িরা দীর্ঘ বছর যাবৎ কোন ধরনের বিরোধ ব্যতিরেকে চাষাবাদ করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি ১) মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা– মোঃ কালুমিয়া, ২) মোঃ হানিফ, পিতা– মোঃ আমজাদ হোসেন, ৩) মোঃ হাফেজ, পিতা– মোঃ হানিফ, ৪) মোঃ ফরিদ, পিতা– মোঃ মুক্তার, ৫) মোঃ আবু তাহের, পিতা– মোঃ আঃ খালেক, ৬) মোঃ আলতাফ খাঁ, পিতা– মোঃ রতন খাঁ ও ৭) মোঃ মুক্তার প্রমুখ মেইনীদোর ইউনিয়নের সোনাই ব্লকের সেটেলার বাঙালিরা ক্রয়সূত্রে জমির মালিক হিসেবে দাবি করে জমিতে চাষাবাদ না করার জন্য বাধা প্রদান করছে।

সেনা-মদদপুষ্ঠ সশস্ত্র দলগুলোর তৎপরতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও যোগসাজশে সেনা-সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন যথাক্রমে সংস্কারপন্থী খ্যাত জেএসএস এবং দলচ্যুত আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি)-কে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা এবং এদের দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অপহরণের রাজত্ব কায়েম করার কাজ অব্যাহতভাবে চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গত ৩ নভেম্বর ২০১৯ দুপুর ২:১৫ ঘটিকায় সংস্কারপন্থীরা লংগদু উপজেলাধীন ধনপুদি বাজার থেকে ভাগ্যজ্যোতি মারমা ওরফে অপু (২৬) পিতা সুনিল মারমাকে অপহরণ করে। অপহৃত ব্যক্তির বাড়ি লংগদু ইউনিয়নের মধ্য খাড়িকাটা গ্রামের অধিবাসী বলে জানা গেছে। অপরদিকে ১৩ নভেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় সংস্কারপন্থী দালালরা লংগদু উপজেলাধীন করল্যাছড়ি গ্রামের নিবাসী মিহির কিরণ চাকমা (বড়মো), পিতা রাজেন্দ্র প্রসাদ চাকমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তিনদিন পর সংস্কারপন্থীরা মিহির কিরণ চাকমাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি জেলার মগবান ইউনিয়নের বড়াদম এলাকায় সংস্কারপন্থী খ্যাত একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্রসহ স্পীডবোট যোগে এসে বিক্রম চাকমা নামে জনৈক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। কোন কোন অনলাইন নিউজপোর্টেলে ও জাতীয় পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে নিহত বিক্রম চাকমাকে জনসংহতি সমিতির চাঁদা কালেক্টর এবং চাঁদা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে কল্পিত সংবাদ প্রচার করা হয়। জনসংহতি সমিতি কোন ধরনের চাঁদাবাজি বা চাঁদা ভাগাভাগির সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি প্রতিবাদ করে। নিহত বিক্রম চাকমাকে জনসংহতি সমিতির চাঁদা কালেক্টর সাজিয়ে সংবাদ প্রচার করার অপচেষ্টা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের এগোজ্যাছড়ি গ্রামে এক ব্যক্তিকে সংস্কারপন্থী জেএসএস ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম শুভ চাকমা গ্রীক (৪০) বলে জানা গেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদা আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পক্ষে সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার নামে ও ভূয়া স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ভূয়া, সাজানো ও ভিত্তিহীন নির্দেশনা/চিঠি কে বা কারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়েছে এবং সেই ভূয়া দলিলের উপর ভিত্তি করে কতিপয় অনলাইন পত্রিকা যেমন– পার্বত্যনিউজ.কম, আলোকিত রাঙ্গামাটি, বাংলা টিবিউন ইত্যাদি নিউজপোর্টালে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

অপরদিকে গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ সকালে স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও সেনাবাহিনীর সমর্থিত দলচ্যুত আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি)-এর একটি গ্রুপ অস্ত্র-শস্ত্রসহ মদ্যপ অবস্থায় বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ৮নং নোয়াপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে। প্রবেশ করেই তারা এলাকার যুবক ও পুরুষদের ধরপাকড় শুরু করে এবং তাদেরকে মারপিট করতে থাকে। অবশেষে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় সময় নোয়াপাড়ার কার্বারী (গ্রাম প্রধান) মোনারাম তঞ্চঙ্গ্যা (৫৫) ও তার ছেলে সুখমণি (শুক্রমনি) তঞ্চঙ্গ্যা (৩২) সহ চারজন গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দিলেও মোনারাম তঞ্চঙ্গ্যা ও সুখমণি তঞ্চঙ্গ্যাসহ বাকি তিনজনকে সন্ধ্যার দিকে

গাইন্দা ইউনিয়ন ও রাজভিলা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বালুমুড়া স্থানে নিয়ে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর যোগসাজশে সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিজিবি ও প্রশাসন কর্তৃক জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, খুন-খারাবি, সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজির অভিযোগ আনার অপচেষ্টাকে বৈধতা দানের হীনউদ্দেশ্যে দলচ্যুত এএলপি নামক বিদেশী সশস্ত্র গোষ্ঠী কর্তৃক নিরীহ তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীদেরকে নৃশংস হত্যার ঘটনাকে জনসংহতি সমিতির দু' গ্রুপের মধ্যেকার সংঘর্ষ বলে সেনাবাহিনী থেকে এসব গণমাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হয় এবং তা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে বিবিসি ও প্রথম আলোর মতো বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমসহ সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত অনলাইন সংবাদ পোর্টালে ফলাওভাবে প্রচার করা হয়।

এমনকি ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে না গিয়ে এবং ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও ময়না তদন্ত না করে রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার ও রাজস্থলী থানার ওসিসহ পুলিশ ও প্রশাসন এ ঘটনাকে জনসংহতি সমিতির 'সশস্ত্র দু'গ্রুপের' মধ্যে সংঘটিত ঘটনা বলে নিশ্চিত করে সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছে এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো তা সঠিক মনে করে সন্ধ্যার পর পরই (ঘটনার দুই/এক ঘন্টার মধ্যে) প্রচার করতে শুরু করে। পার্বত্যনিউজ.কম তো "নিহত সন্ত্রাসীরা চলতি বছরের ১৮ মার্চ বাঘাইছড়িতে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের উপর হামলার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে" বলেও আগাম সংবাদ দিয়েছে। মূলত, গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা নিয়ে এএলপিকে দিয়ে শাসকদলের যোগসাজশে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর এই হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে এসব সংবাদ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। হত্যার শিকার এসব গ্রামবাসী জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য নন এবং তারা কোন প্রকার সশস্ত্র তৎপরতার সাথেও যুক্ত নন। আরো উল্লেখ্য যে, এসব কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এএলপিকে দিয়ে খুন-সন্ত্রাস চালিয়ে এসব এলাকার তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করার দীর্ঘদিন ধরে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও যোগসাজশে কখনো কখনো স্থানীয়ভাবে 'মগ লিবারেশন পার্টি' নামে পরিচয়দানকারী এএলপি নামক বিদেশী সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং সংস্কারপন্থী খ্যাত তাঁবেদার সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, সংঘাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। আর সেনা-সমর্থিত এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো দ্বারা সংঘটিত ঘটনাকে দোহাই দিয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ নিরীহ গ্রামবাসীর উপর নির্বিচারে তল্লাসী, মিথ্যা মামলা দায়ের, অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যাসহ ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে।

অপরদিকে গত ২০ নভেম্বর ২০১৯ আবার বান্দরবান সদর থেকে এএলপি কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের তালুমপাড়ার সুজন তংঞ্চঙ্গ্যা পিতা: বাবুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা সাং তালুমপাড়া এবং টিপন জয় তঞ্চঙ্গ্যা (১৭), পিতা চোখ্য মণি তংঞ্চঙ্গ্যা নামে ২ জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়।

কুহালঙে বিদেশি সন্ত্রাসী এলএলপি কর্তৃক চাকমা গ্রামে হামলা, ১টি বাড়ি অগ্নিসংযোগ

গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ দিবাগত রাত ৯.০০ ঘটিকায় বান্দরবান সদর কুহালং ইউনিয়নের কাউলী নোয়াপাড়া গ্রামে বিদেশি সন্ত্রাসী এএলপি কর্তৃক ৭টি আদিবাসী চাকমা পরিবারে হামলা চালিয়েছে। প্রাণের ভয়ে চাকমা গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেলেও তাদের ১টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এএলপির হামলার শিকার নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা হলেন– (১) ধারজচন্দ্র কার্বারী, (২) মোহিনী রঞ্জন চাকমা, (৩) জ্ঞানলাল চাকমা, (৪) সুপংকর চাকমা, (৫) বলি চাকমা (৬) রংঙে চাকমা (প্রাক্তন ভূটানপাড়া কার্বারী) ও (৭) রহিন চাকমা।। এখনো পর্যন্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পাড়াবাসীরা।

চলছে এএলপিদের চাঁদাবাজি

বান্দরবানে বেড়ে চলছে এএলপিদের চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে এএলপি ও স্থানীয় প্রভাবশালী ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দিন দিন মতভেদটা চরমতম রূপ ধারন করছে বলে মনে হচ্ছে। গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বান্দরবান সদর হতে ৪টি মোটর সাইকেল যোগে ৮-১০ জন এসে মোমবাতং পাড়ায় এএলপির সমর্থিত দুইজনকে বেধড়ক মারপিট করে চলে যায়। তাদের মধ্যে কেউ গণচাঁদা সহনীয় পর্যায়ে নেয়ার পক্ষে আর কেউ বেশি মাত্রায় নেয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে রূপ ধারন করছে। একটা দলে গণচাঁদা না দেয়ার জন্য বাধা দিচ্ছে। সেই গণচাঁদা বিকাশে উত্তোলনের সময় গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ চিম্বুকে দুইজন এএলপি'কে হাতেনাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ১৮ জানুয়ারি এএলপির আরো তিনজনকে জমজম হোটেল থেকে প্রচুর টাকাসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য যে, বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ও কুহালং এবং রোয়াংছড়ি উপজেলায় প্রায় ৩০টি গ্রামে গ্রাম প্রতি ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে চাঁদা দাবি করছে এএলপি সন্ত্রাসীরা।

সংস্কারপন্থী কর্তৃক রাঙ্গীপাড়া গ্রামের কার্বারীকে অপহরণ

গত ৭ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় লংগদু উপজেলার রাঙ্গীপাড়া গ্রামের কার্বারী কালি কুমার চাকমা (৫৫). পিতা মৃত মহিমা রঞ্জন চাকমাকে মেইনীদোর বাজার থেকে অপহরণ করেছে সংস্কারপন্থীরা। মেইনীদোর লঞ্চঘাট থেকে কালি কুমার চাকমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেসময় সংস্কারপন্থীদের সাথে লংগদু জোনের একজন লোক ছিল বলে জানা গেছে। পরে এলাকাবাসীর চাপের মুখে কালি কুমার চাকমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা।

সাজেক-কমলাক সংযোগ সড়কে আদিবাসী জুম্মদের বাগান-বাগিচা ধ্বংস

বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার বাংলাদেশ অংশে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের অধীন রুইলুই হতে বড় কমলাক এলাকা পর্যন্ত একটি ট্রানজিট সড়ক নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৫০ কিলোমিটার। সড়কটি সিজকছড়া, দাড়িপাড়া, বলপিয়ে, উপরের চইনালছড়া, নীচের চইনালছড়া, বড় কমলাক হয়ে সাজেক তীর পর্যন্ত যাবে।

খবর পাওয়া গেছে, এই সড়কটি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের মামিট জেলাধীন মার বাজার থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত সড়কটির সাথে যুক্ত হবে। এই পরিকল্পনার আওতায়, ২০১৯ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে, ১১৯ আরসিবি (ইঞ্জিনিয়ারিং কোর) হতে জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ভারতীয় অংশীদারকে আমন্ত্রণ ব্যতিরেকেই এই ট্রানজিট সড়ক নির্মাণ শুরু করার জন্য রুইলুই থেকে বড় কমলাক পর্যন্ত একটি জরিপ চালায়। পরবর্তীতে ৫ জুন ২০১৯ বাংলাদেশ সরকার রুইলুই থেকে বড় কমলাক পর্যন্ত এই ট্রানজিট সড়কের নির্মাণের জন্য সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই এলাকায় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে ভারতীয় অংশীদারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল কমান্ডিং অফিসার (জিওসি) মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান, খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হামিদুল হক, বাঘাইহাট জোনের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. কর্নেল হুমায়ুন, অপরদিকে ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ'র ডিরেক্টর জেনারেল। বিএসএফ'র ডিরেক্টর জেনারেল সড়কটির নির্মাণ শুরু করেন। সড়কটির নির্মাণ শুরু করার জন্য ইতিমধ্যে অনেক বুলডোজার ও ট্রাক্টর নিয়ে আনা হয়।

প্রায় ৩০০ পরিবার অধ্যুষিত বড় কমলাক, চইনালছড়া ও সিজকছড়া সহ অন্তত পাঁচটি গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসী তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারকে বিবেচনায় না নিয়ে যদি এই সড়ক নির্মাণ করা হয়, তাহলে তারা তাদের ভূমি হারাবে। গ্রামবাসীরা ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং ইন্ডিজেনাস ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ কর্তৃক স্বীকৃত, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিমালার আওতায় প্রথাগত ভূমি অধিকারের অধীনে তাদের ভূমিতে চাষাবাদ করে আসছে। তাই, তারা রুইলুই হতে বড় কমলাক পর্যন্ত ট্রানজিট সড়কটির নির্মাণ শুরু করার পূর্বে তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাজেক অধিবাসীদের অন্তত ৯০% ভাগই অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পরিবার, যারা ১৯৭০ হতে ৯০ দশকের মধ্যে অস্থিতিশীলতার সময় তাদের নিজেদের গ্রাম ও বাড়িঘর হতে উচ্ছেদের শিকার হয়েছিলেন। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারসমূহকে যেখান থেকে তারা উচ্ছেদ হয়েছিলেন তাদের সেই ভূমিতে পুনর্বাসনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বিধান থাকা সত্ত্বেও, চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত ২২ বছরেও সরকার তাদেরকে পুনর্বাসন করেনি।

এই সংযোগ সড়ক নির্মাণকালে ইতিমধ্যে রাস্তার মধ্যে পড়ে অনেক গ্রামবাসীর জায়গা-জমি ও বাগান-বাগিচার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো– (১) দাড়ি পাড়ার চয়ন চাকমা, পিতা প্রভাত চন্দ্র চাকমার ৩.০ একর সেগুন বাগিচার ২,৫০০টি গাছ; (২) দাড়ি পাড়ার জগদীশ চাকমা, পিতা সুচীচন্দ্র কার্বারীর ১.০ একর সেগুন বাগিচার ৯০০টি গাছ; (৩) দাড়ি পাড়ার বিনল চাকমার ২.০ একর বাগানের ১৫০টি নারিকেল গাছ ও ৪০০টি সুপারি গাছ; (৪) দাড়ি পাড়ার অনিল কুমার চাকমা, পিতা মেলারাম চাকমার ৩.০ একর বাগানের ৪০০টি লিচু গাছ; (৫) মন মোহন চাকমার ২.০ একরের সেগুন বাগান ও হলুদ ক্ষেত; (৬) দাড়ি পাড়ার প্রেম রঞ্জন চাকমা, পিতা প্রভাত চন্দ্র চাকমার ১.০ একর বাগানের ৫০০টি সেগুন গাছ; (৭) দাড়ি পাড়ার বাত্যে চাকমা, পিতা অনন্ত কুমার চাকমার ২.০ একরের হলুদ ক্ষেত ও ঝাড়ু বাগান; (৮) দাড়ি পাড়ার সুমতি রঞ্জন চাকমা, পিতা অনন্ত কুমার চাকমার ২.০ একরের হলুদ ক্ষেত ও ঝাড়ু বাগান ক্ষতি হয়েছে।

পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী এবং চুক্তি বিরোধীদের প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব সমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন" এই স্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২২তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পিসিপির দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে

কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুমন মারমা, যুব সমিতির সদস্য সাগর ত্রিপুরা নান্টু, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা।

ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য করে প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার বলেন, 'ছাত্র নং, অধ্যায় নং, তপঃ' ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব হল পড়াশোনা করা। অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজকে ভালভাবে রাজনীতিকে বুঝতে হবে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে হবে না, মানুষের মত মানুষ হতে হবে। মনে রাখবেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে বাস্তবায়ন হতে না পারে সেজন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল উঠে পড়ে লেগেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সকল মৌলিক বিষয়সমূহ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাগুলো এখনও পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। যার কারণে আজ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী একপেশে ভূমিকা পালন করছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন হলে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না, অহেতুকভাবে ভুল বুঝিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

উষাতন তালুকদার আরও বলেন, পার্বত্যাঞ্চলের যে সমস্যা সেটি চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো আমলে নিয়ে আমরা একটি সুষ্ঠু সমাধানের দিকে যেতে পারি। এটাকে অহেতুকভাবে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখলে কারোর জন্য মঙ্গলজনক হবে না। যাতে করে চুক্তি বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে অনেকে ভুল ব্যাখ্যা দেন, চুক্তি বাস্তবায়ন হলে বাংলা ভাষাভাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চলে যেতে হবে এটা ঠিক নয়, কারোর অধিকার এখানে খর্ব করা হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ভূমি কমিশনের কার্যক্রমে বাধা দেওয়া হয়, আগে ভূমি কমিশনকে কাজ করতে দিন, যদি কমিশন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে শুধরানোর সুযোগ তো আছে। আগামীতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র ও যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

সকালে অনুষ্ঠান শুরু থেকে সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চালায়। পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুমন মারমার সাথে অশোভন আচরণ করে এবং তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সুমন মারমাকে অনুষ্ঠান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি প্রদান করে গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের বাইরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারি বাহিনীর এমন অগণতান্ত্রিক আচরন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করছে। গোয়েন্দা বাহিনীর নানা বাধা-নিষেধ, হুমকি-দামকি সত্ত্বেও পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্তি হয়। পরিশেষে মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, জগদীশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

Jumma Barta, 10th Issue, November 2019 – January 2020, irregular news bulletin of Parbatya Chattagram Jana Smahati Samiti (PCJSS), has been published and circulated by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts.
E-mail: pcjss.org@gmail.com, Web: pcjss.org